ভৈরব তীরের বিস্মৃত শৌর্য ও আধুনিকতার জনপদ মেহেরপুর

“খনা-মিহিরের জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে মুজিবনগরের প্রথম সূর্যোদয়—ভৈরব তীরের এক অবিনশ্বর জনপদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংগ্রামী ইতিহাসের প্রামাণ্য ইশতেহার।”

১. জনপদের প্রাচীনত্ব: ভৈরব ও মাথাভাঙ্গার আদি সাক্ষ্য

মেহেরপুর নামটির পেছনে যেমন সাধক মেহের আলী শাহর স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তেমনি এই জনপদকে ঘিরে আছে ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা নদীর হাজার বছরের ইতিহাস। এক সময় এই নদীগুলোই ছিল বাংলার বাণিজ্যের ধমনী। আমরা কি জানি, আজ থেকে কয়েকশ বছর আগে মেহেরপুর ছিল অবিভক্ত বাংলার অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র? বিশেষ করে নীল চাষের আগে এখানে দেশি তাঁতশিল্প এবং কৃষিপণ্যের যে প্রাচুর্য ছিল, তা পুরো মহকুমার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত।

২. আমঝুপির নীলকুঠি: শোষণের বিরুদ্ধে নীরব দ্রোহ

মেহেরপুরের ইতিহাসে নীলকুঠি এক বেদনার নাম। আমঝুপির নীলকুঠি কেবল সাহেবদের বিলাসের আস্তানা ছিল না, এটি ছিল মেহেরপুরের কৃষকদের ওপর ব্রিটিশ শোষণের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হলো—এই মেহেরপুরের মাটি থেকেই নীল চাষের বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল। এখানকার কৃষকরা কেবল লাঙল ধরতে জানত না, তারা অধিকার আদায়ের জন্য ব্রিটিশ বন্দুকের নলের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতেও জানত। মেহেরপুরের নীল বিদ্রোহের সেই ঝোড়ো হাওয়া পরবর্তীতে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

৩. খনা ও মিহিরের বসতভিটা: জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূতিকাগার

মেহেরপুরের সবচেয়ে বড় গর্বের জায়গাটি আমরা অনেকেই এড়িয়ে যাই। লোকঐতিহ্য ও ইতিহাসবিদদের মতে, কিংবদন্তি জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির এবং তার পুত্রবধূ খনার বসতি ছিল মেহেরপুরের ভৈরব তীরের ‘চন্দ্রভাগ’ গ্রামে। খনার বচন আজও আমাদের কৃষি সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। একটি জনপদ কতটা মেধাবী হলে সেখানে শত শত বছর আগে নক্ষত্রের গতিবিধি আর আবহাওয়ার নিখুঁত হিসাব কষা হতো, তা ভাবলে আজও অবাক হতে হয়। মেহেরপুর কেবল রাজনীতির নয়, এটি ছিল এই

উপমহাদেশের আদি বিজ্ঞানচর্চার এক নীরব সাক্ষী।

৪. মেহেরপুরের আধ্যাত্মিক সুবাস: পীর ও বাউলের মিলনস্থল

আধ্যাত্মিকতায় মেহেরপুর সবসময়ই উদার। সাধক মেহের আলী শাহর নামানুসারে এই শহরের নামকরণ যেমন এর সুফিবাদী ঐতিহ্যকে জানান দেয়, তেমনি মেহেরপুরের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে আছে নাম না জানা অসংখ্য বাউল ও ফকিরদের গান। এখানকার মানুষের রক্তে মিশে আছে অসাম্প্রদায়িকতার বীজ। মেহেরপুরের সেই বাউল গানগুলো কেবল সুর নয়, ছিল জীবনের গভীর দর্শন।

মেহেরপুরের দ্রোহ ও জাগরণের ইতিকথা

৫. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন: মেহেরপুরের তপ্ত রাজপথ

মেহেরপুর কেবল শান্ত সুফিবাদী জনপদ ছিল না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এটি ছিল এক আগ্নেয়গিরি। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মেহেরপুরের সন্তানদের অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকা উচিত। বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের সময় মেহেরপুরের যুবকরা যেভাবে বিলিতি পণ্য বর্জন করেছিল, তা ছিল অভাবনীয়। আমরা কি জানি, বিপ্লবি বাঘা যতীনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের এক গোপন আস্তানা ছিল মেহেরপুরের এই নিভৃত পল্লীগুলোতে? মেহেরপুরের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিল। এই মাটির মানুষের ধমনিতে বইছে সেই দ্রোহের রক্ত, যা কোনোদিন মাথা নত করতে শেখেনি।

৬. শিক্ষা বিস্তারের কারিগর: মেহেরপুর হাই স্কুলের ঐতিহ্য

একটি জাতির মেরুদণ্ড যে শিক্ষা, তা মেহেরপুরের মানুষ বুঝেছিল অনেক আগে। ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত মেহেরপুর মডেল হাই স্কুল (বর্তমানে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি ছিল এই অঞ্চলের আধুনিকতার প্রবেশদ্বার। যখন সারা বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে গোঁড়ামি ছিল, তখন মেহেরপুরের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে এই স্কুলটি দাঁড় করিয়েছিলেন। এই স্কুলের বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেছেন এমন অনেক কৃতি সন্তান, যারা পরবর্তীতে সারা ভারতে মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। মেহেরপুর কেবল কৃষির ওপর নির্ভর করেনি, তারা কলমকেও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছিল।

৭. নীল বিদ্রোহের বীরগাঁথা: আমঝুপির রক্তরাঙা ইতিহাস

আমরা নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের কথা শুনি, কিন্তু মেহেরপুরের সেই বীর চাষিদের নাম জানি না যারা নীল চাষ করতে অস্বীকার করে কারাবরণ করেছিলেন। আমঝুপির নীলকুঠি ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণের দুর্গ। কিন্তু মেহেরপুরের সাহসী কৃষকরা যখন জোটবদ্ধ হয়ে নীল বুনা বন্ধ করে দিল, তখন লন্ডনের পার্লামেন্ট পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। সেই বিদ্রোহের সময় স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদারদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ যেভাবে একতাবদ্ধ হয়েছিল, তা বর্তমান প্রজন্মের জন্য এক বড় শিক্ষা। মেহেরপুর শিখিয়েছে—একতাই হলো শোষণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

৮. ভাষা আন্দোলন ও মেহেরপুরের চেতনা

১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলনেও মেহেরপুর পিছিয়ে ছিল না। ঢাকার রাজপথে যখন সালাম-বরকতরা রক্ত দিচ্ছিলেন, মেহেরপুরের ছাত্রসমাজ তখন ভৈরব তীরের রাজপথে মিছিল বের করেছিল। পাকিস্তান সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মেহেরপুরের অলিগলিতে তখন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—’রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মেহেরপুরের মানুষের মনে স্বাধীনতার বীজ বপন করা হয়েছিল, যা ১৯৭১ সালে মুজিবনগরের আম্রকাননে এসে পূর্ণতা পায়।

মেহেরপুর—স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সূর্যালোক

৯. মুজিবনগর: আম্রকাননের সেই অবিনশ্বর শপথ

মেহেরপুরের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম মুকুট হলো মুজিবনগর। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনা ছিল না, এটি ছিল বিশ্বমানচিত্রে একটি নতুন জাতিসত্তার আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ। মেহেরপুরের সেই ধূলিকণা ধন্য হয়েছিল জাতীয় চার নেতা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পদভারে। মেহেরপুরের সাধারণ মানুষ সেদিন যে আতিথেয়তা এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল, তা স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। মেহেরপুর কেবল একটি জেলা নয়, এটি হলো বাঙালির সার্বভৌমত্বের প্রথম ঠিকানা।

১০. ভৈরব তীরের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

মেহেরপুরের মাটি কেবল ফসল ফলায় না, এটি ফলায় কবিতা, গান আর

সংস্কৃতি। মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরি থেকে শুরু করে টাউন হলের সেই পুরনো আড্ডাগুলো সাক্ষী দিচ্ছে যে, এখানকার মানুষ কতটা জ্ঞানপিপাসু। স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় বারবার উঠে এসেছে মেহেরপুরের শান্ত নিসর্গ আর মানুষের সহজ-সরল জীবনবোধ। মেহেরপুরের বাউল মেলা আর লোকজ উৎসবগুলো আজও প্রমাণ করে যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের এই মাটির সহজাত বৈশিষ্ট্য।

১১. আগামীর মেহেরপুর: ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আধুনিকতা

আজকের মেহেরপুর উন্নয়নের মহাসড়কে পা রেখেছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, উন্নয়ন মানে কেবল বহুতল ভবন বা প্রশস্ত রাস্তা নয়; উন্নয়ন মানে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে লালন করা। আমঝুপির নীলকুঠি থেকে মুজিবনগরের স্মৃতিসৌধ—সবই আমাদের প্রেরণার উৎস। মেহেরপুর প্রতিদিন-এর এই বিশেষ সংখ্যায় আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত, আমরা আমাদের উত্তরসূরিদের কাছে এই বীরত্বগাঁথা পৌঁছে দেব। আমরা যেন ভুলে না যাই, আমরা খনা-মিহিরের উত্তরসূরি, আমরা নীল বিদ্রোহের উত্তরসূরি, আর আমরাই হলাম স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সূর্যোদয়ের সাক্ষী।

উপসংহার: শেকড়ের টানে মেহেরপুর

মেহেরপুর একটি অনুভূতির নাম। ভৈরব নদীর শান্ত স্রোত যেমন তার দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী, তেমনি এখানকার মানুষের অদম্য প্রাণশক্তি তার আগামীর দিশারি। ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ তার লেখনীর মাধ্যমে এই জনপদের সুখ-দুঃখ আর ইতিহাসের মশাল জ্বালিয়ে রাখুক—প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এটাই আমার প্রত্যাশা। মেহেরপুরের প্রতিটি ধূলিকণায় লুকিয়ে আছে হাজার বছরের বীরত্ব ও মেধার গল্প; সেই গল্পগুলো যেন কোনোদিন ধুলোয় হারিয়ে না যায়।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে

মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কমান্ডের শ্রদ্ধা নিবেদন

আজ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর আম্রকাননে শপথ নেয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার। তারপর থেকেই দিনটি মুজিবনগর দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

তবে এ বছর সরকারীভাবে কোন কর্মসূচী নেওয়া হয়নি। তবে, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড কাউন্সিলের সদস্যরা মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

আজ শুক্রবার সকাল ৯ টার সময় মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কমান্ডের পক্ষ থেকে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে জাতীর শ্রেষ্ট সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খাঁন, মুক্তিযোদ্দা সন্তান সংসদ কমান্ডের মুজিবনগর উপজেলো সভাপতি মোখলেছুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম সহ অন্যান্য সদস্যরাউপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
বীর মুক্তিযোদ্ধা (অব.) ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক বলেন, ‘১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস কোন রাজনৈতিক দিবস নয়। এটি মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ দিন। যে সরকারই আসুক না কেন এদিনটি সরকারি ভাবে পালন করা উচিৎ। যদিও আজ দিনটি সরকারি পালন হচ্ছে না। আমরা ব্যথিত হয়েছি।’
এদিকে, বিকাল ৩ টার দিকে ঢাকা থেকে আগত নাগরিক সমাজ নামের একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা রয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের সাক্ষি

ওরা

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ খ্রিস্টান পল্লী মেহেরপুরের মুজিবনগর। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর-এর আম্রকাননে শুধু একটি শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়নি; সেখানে ইতিহাস গড়ে উঠেছিল অসংখ্য ছোট ছোট মুহূর্ত, নিঃশব্দ শ্রম আর সাধারণ মানুষের অসাধারণ অংশগ্রহণে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ একটি দিন, একটি দৃশ্য, একটি নিঃশব্দ প্রত্যয়ের নাম। মুজিবনগর-এর সেই বৈদ্যনাথতলার আম্রকানন আজও যেন বাতাসে বহন করে সেই গোপন প্রস্তুতির গন্ধ, গ্রামবাসীর নিঃশব্দ সাহসের প্রতিধ্বনি। সকালের রোদ তখন নরম। আমগাছের ছায়া মাটিতে ছোপ ছোপ আলো ফেলেছে। ১৩ এপ্রিল মুজিবনগর আম্রকানন-এ দাঁড়িয়ে মনে হলো এই নীরবতা কখনোই নিছক নীরব ছিল না। ১৯৭১-এর সেই দিনটিতে, এই মাটিই ছিল উত্তাল ইতিহাসের কেন্দ্র।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে পপথ গ্রহণ করেন। দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন সরকার গঠনের মাধ্যমে বিলুপ্তি হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের ঐতিহাসিক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা (বর্তমানে মুজিবনগর) গ্রামের সাধারণ মানুষ সরাসরি অংশ না নিলেও, তাদের সহযোগিতা ছাড়া এই সরকার গঠন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হতে পারতো না। তাদের ভূমিকা ছিল সমর্থন, সহানুভূতি, নিরাপত্তা, এবং সরবরাহ সংক্রান্ত সহায়তায়।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য যেকোনো ধরনের প্রস্তুতির জন্য গ্রামবাসীরা সহায়তা করেছিলেন। যেমন- মঞ্চ নির্মাণ, অতিথিদের জন্য স্থান তৈরি, খাবার এবং পানীয় সরবরাহ, অতিথিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। তারা এই কাজগুলো নিজেরাই করেছিলেন।

সূর্য সেদিন ছিল নির্মম। বৈশাখের খরতাপ যেন মাটিকেও দগ্ধ করছিল। সূর্যও যেখানে মুজিবনগর আম্রকাননকে কুর্ণিশ করে। সেই মুজিবনগর আম্রকানন-এর গাছের ছায়াও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই তাপদাহ উপেক্ষা করেই ইতিহাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এক টুকরো বাংলাদেশ। সেদিন মেহেরপুরের ১২ জন আনসার সদস্য। সাধারণ পোশাকে, কিন্তু চোখে কঠোর দৃঢ়তা। তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে, সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানান নবগঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার-কে।

মুজিবনগরের দারিয়াপুর ডিগ্রী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক বাকের আলী সেই শপথ অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেছিলেন। তিনি জানান, সেদিন খুব সকালে জাতীয় নেতৃবৃন্দ মুজিবনগরে উপস্থিত হন। তিনি তাদের চিনতেন না। স্থানীয় নেতাদের সাথে তিনি জাতীয় নেতাদের সন্মুখে গেলে অনুষ্টানে তাকে কোরআন তেলোয়াতের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নেতৃবৃন্দ তার নাম লিখে নিলেন এবং রিহার্সালের সময় তেলোয়াত শুনলেন। মাত্র ৩০ মিনিট অনুষ্ঠানটির স্থায়ীত্ব থাকলেও উপস্থিত সকলের মধ্যে ছিল স্বাধীনতার উম্মাদনা ও জীবনবাজির শপথ।

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সামরিক কায়দায় সালাম দিয়েছিলেন মেহেরপুরের ১২জন আনসার সদস্য। ইতোমধ্যে ১০ জন মারা গেছে। বেঁচে আছেন দুইজন। এদেরই একজন বয়োবৃদ্ধ মো. সিরাজ উদ্দীন। প্রতিদিন তিনি মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে আসেন। তিনি বলেন- সেদিন আমাদের ডাক পড়েছিল বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে রাস্ট্রিয় মর্যাদায় সালাম জানানোর। আমরা গার্ড অব অনার দিয়েছিলাম ১২ জন আনসার। ওইদিনই ট্রেনিং দিয়েছিলেন তৎকালীন ঝিনাইদহের সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার (এসডিপিও) মাহবুব উদ্দীন। তাঁর নেতৃত্বেই আমরা গার্ড অব অনার দিই সরকারকে। আর এক আনসার সদস্য আজিম উদ্দীন বলেন- তখন আনন্দ ভয় উত্তেজনা কাজ করছিলো। দেশি বিদেশী সাংবাদিকসহ হাজারো মানুষের সামনে প্রথম সারকারকে সালাম জানানোর সময় মনে যে প্রশান্তি পেয়েছিলাম তা বলে বোঝানো যাবেনা। পরে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

প্রত্যক্ষদর্শীর সুভাষ মল্লিকের ভাষায়- ওদের হাতে আধুনিক অস্ত্র ছিল না, কিন্তু যে ভঙ্গিতে সালাম দিল- মনে হচ্ছিল এটাই স্বাধীন দেশের প্রথম সেনাবাহিনী। সেই অভিবাদন ছিল প্রতীকী, কিন্তু তা-ই হয়ে উঠেছিল ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সূচনালগ্নের প্রতিচ্ছবি।

মুজিবনগর স্মৃতিপ্রকল্প এলাকায় দেখা মেলে প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শী আহম্মদ খাঁ (৭১) রিক্সা ভ্যানে করে শষা ফেরি করছেন। তিনি বলেন- সে বছরই আমার বিয়ে হয়। ১৭ এপ্রিল শপথ অনুষ্ঠানের দিন হঠাৎ করেই হাজার মানুষ জড়ো হলো মুজিবনগরের এই আমবাগানে। তখন বাগানটি ভাগাড় হিসেবে গ্রামের মানুষ ব্যবহার করতো। সেদিন আমিসহ একদল যুবক বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুড়ি সংগ্রহ করে মানুষকে খেতে দিই। আশপাশের বাড়ি থেকে বউ ঝিরা পানি এনে মানুষের পিপাসা মিটায়। সেদিন সেই সরকারের পরিচালনায় দেশ স্বাধীন হয়। এখন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□-□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□; □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□- □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□- □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□, □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□Ñ □□□□□ □□□□□□, □□□, □□□□Ñ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□- □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□, □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

---

# □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ ‘□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□’ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□

ভাঙচুর চলে। এরপর প্রায় ২০ মাস ভাঙচুর অবস্থায় পড়ে আছে মুক্তিযুদ্ধকালীন কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার ত্রিমাত্রিক শিল্পরূপগুলো।

এগুলো প্রতিস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠিয়েছে জেলা প্রশাসন। তবে এখনো কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।দুই যুগেরও আগে ৭২ একর জমি অধিগ্রহণ করে ১১টি মন্ত্রণালয়ের প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র নির্মাণের কাজ। এই প্রকল্পের মধ্যে ছিল পর্যটক মোটেল, শপিং মল, শিশুপরিবার, ডাকঘর, হেলিপ্যাড, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ছয় দফাভিত্তিক মনোরম গোলাপবাগান, অত্যাধুনিক মসজিদ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলাদেশের মানচিত্র ও জাদুঘর।
এখন পর্যন্ত এসব কোনো স্থাপনাই আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়নি। প্রকল্পের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ধাপের কাজ শেষ হয় অন্তত ১০ বছর আগে। সর্বশেষ সাড়ে আট কোটি টাকা ব্যয়ে বড় মিলনায়তন নির্মাণের কাজ শেষ হয়।
তবে এখনো প্রশাসনিক প্লাজা, অ্যাপ্রোচ রোড, জেনারেটর ক্রয় (১০০-কেভিএ), মানচিত্রের স্টেজে কাঠের কাজ, সিঁড়িতে এসএস রেলিং, জলছাদ, র্যাম্প ও এসপিএমসিবি পাওয়ার সকেট, আন্ডারগ্রাউন্ড সার্ভিস লাইনের কাজ শেষ হয়নি।

নির্মিত বেশ কিছু স্থাপনায় ইতিহাস বিকৃত করারও অভিযোগ ওঠে। ৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধে সেক্টরভিত্তিক বাংলাদেশ মানচিত্র নির্মাণকাজ শেষ হয়ে ১০ বছর পেরিয়ে গেলেও আজও আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়নি। মানচিত্রে মুজিবনগরের শপথ নেওয়ার কোনো চিত্র স্থান পায়নি। গার্ড অব অনারের ভাস্কর্যে ১২ জন আনসার সদস্যের বিপরীতে দেখানো হয় আটজনকে। সেক্টরভিত্তিক কমান্ডারদের ভাস্কর্যও রাখা হয়নি।
প্রথম দিকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার ভাস্কর্য স্থান পেলেও ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিন পর সেই ভাস্কর্যটি ভেঙে ফেলা হয়, যা নিয়ে বিএনপি সে সময় প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে।
মানচিত্রের বাইরে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ভাস্কর্যসহ অন্যান্য ভাস্কর্যগুলো এতটাই নিম্নমানের ছিল, যা মাঝেমধ্যেই ভেঙে পড়ত। অনেকটির ভেতরে রডের বদলে চিকন তার ব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলে শিলাবৃষ্টি বা ঝড় হলে সেগুলো প্রায়ই ভেঙে যেত। কয়েক দফা সেগুলো ফের মেরামতও করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথগ্রহণের স্থান, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের স্মৃতি, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও

চেতনাসমৃদ্ধ তথ্য ও নিদর্শন দেশবাসী ও তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং বিদেশিদের কাছে মূর্ত করে তুলতে শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে এই স্মৃতিকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৮ সালে কাজ শুরু করে মাঝে প্রকল্পটি কাটাছেঁড়া করা হয়। বেশির ভাগ কাজ শেষ হয় ২০১১ সালে। প্রকল্পের কিছু কাজ অসমাপ্ত থাকা অবস্থাতেই ভাস্কর্যগুলো স্বাধীনতাবিরোধী দুর্বৃত্তরা ভেঙে ফেলে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) শিল্পী রানী রায় বলেন, মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্য প্রতিস্থাপনের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে, তার কোনো প্রতিউত্তর এখনো আসেনি।



নতুন আরো একটি প্রকল্প :

২০২১ সালের ২০মে নতুন করে ৪০৯ কোটি টাকার আরো একটি প্রকল্প অনুমোদন করে তৎকালীন সরকার। যে প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্কাল্পচার গার্ডেন, বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার মেমোরিয়াল মুর্যাল, তিনতলা বিশিষ্ট অ্যাডমিন ব্লক, দুইতলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ব্লক, চারতলা বিশিষ্ট ট্রেনিং সেন্টার, চারতলা বিশিষ্ট অফিসার্স ও স্টাফ কোয়ার্টার, সুইমিং পুল, ফুড

জিয়স্ক ও রেস্টরুম, রেন্টাল শপ, ওয়াচ টাওয়ার, ভিভিআইপি ও ভিআইপি পার্কিং, সাধারণ পার্কিং, মাছ ধরার ডেক, রোপওয়ে, দুইতলা বিশিষ্ট বোট ক্লাব, সুপেয় পানির ডিসপেনসার, ব্যাংক প্রটেকশনসহ লেক, ব্রিজ, কনটোর্স, আইল্যান্ড, ওয়াচওয়ে, চালকদের আবাসন, শিশু পরিবার ও ডরমিটরি, দুইতলা বিশিষ্ট স্কুল, টেনিস কাম বাস্কেটবল কোর্ট, প্লেগ্রাউন্ড, লেজার শো ও ওয়াটার শিল্ডসহ আরো কয়েকটি স্থাপনা নির্মাণ। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে হলে নতুন ৫৬.০৫ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। সব মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্রটির আয়তন ১২৭ একরে রূপ নেওয়ার কথা। জমি অধিগ্রহণসহ এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ ধরা হয় প্রায় ৪১০ কোটি টাকা। প্রয়োজনে প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিরও কথা ছিল।

আমবাগান পরিচর্যার জন্য অপেক্ষা :

মুজিবনগরের ঐতিহাসিক আম্রকাননে বর্তমানে এক হাজার ১০০টি গাছ বেঁচে রয়েছে। পরিচর্যার অভাবে এরই মধ্যে শতাধিক গাছ মারা যাওয়ায় বাগানটি ক্রমেই শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। জীবিত গাছগুলোর পরিচর্যার জন্য মেহেরপুর হর্টিকালচার সেন্টার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ৭০ লাখ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল। দ্রুত গাছ বাঁচানোর প্রকল্পের বরাদ্দ ছাড় হলে কাজ শুরু করা হবে বলে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।

স্বাধীনতা সড়ক :

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভারতের কলকাতা থেকে যে মেঠোপথ ধরে জাতীয় চার নেতাসহ দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা এসেছিলেন সেই পথটিকে স্বাধীনতার অর্ধশত বছর উদযাপন উপলক্ষে ‘স্বাধীনতা সড়ক’ নাম দেওয়া হয়। মেঠোপথটির বাংলাদেশের অংশ ৫০০ মিটার সড়ক এক কোটি চার লাখ টাকা ব্যয়ে এরই মধ্যে পাকাও করা হয়। ২০২১ সালের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে এই সড়কের উদ্বোধন করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী। পরিকল্পনা হয় এই সীমান্তপথে দুই দেশের মধ্যে চলাচল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একটি স্থলবন্দর নির্মাণ হবে। এর সরকারি গেজেটও প্রকাশ হয়। কিন্তু এই কাজের আর কোনো অগ্রগতি নেই।

আজ মুজিবনগর দিবস; নেই সরকারি কোন আয়োজন

আজ ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে।

তার আগে ওই বছরের ১০ এপ্রিল পাকিস্তানে বন্দি থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। এম এ জি ওসমানীকে সরকারের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়।

প্রবাসী এবং অস্থায়ী সেই সরকারের শপথ গ্রহণের স্থান বৈদ্যনাথতলাকে মুজিবনগর নামকরণ করা হয়। মুজিবনগরে তৎকালীন সাব-ডিভিশনাল পুলিশ কর্মকর্তা মাহবুব উদ্দিন আহমদের (বীরবিক্রম) নেতৃত্বে ১২ জন আনসার সদস্য বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। সেদিনের সেই মহতী অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক এবং বিশিষ্ট বাজনীতিবিদরা।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে একটি রেডিও সেন্টার স্থাপন করে প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠান সারা দেশে সম্প্রচার করা হয়েছিল এবং মুজিবনগর সেদিন পেয়েছিল ঐতিহাসিক মর্যাদা।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর বর্বরোচিত হামলা চালানোর পর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার ধারাবাহিকতায় মুজিবনগরে শপথ নেওয়া অস্থায়ী সরকারের সফল নেতৃত্বে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় অর্জন হয়।

এবার নেই সরকারি কোনো কর্মসূচি :

প্রতিবছর সরকারিভাবে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হলেও এবার এ বিষয়ে সরকারি কোনো কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। মেহেরপুর জেলা প্রশাসক (ডিসি) শিল্পি রানী রায় বলেন, ‘১৭ এপ্রিল মুজিবগনর দিবস পালন নিয়ে এখন পর্যন্ত (১৬ এপ্রিল দুপুর সোয়া ১টা পর্যন্ত) সরকারি কোনো নির্দেশনা আসেনি। সরকারি নির্দেশনা যা আসবে আমরা তা প্রতিপালন করব।’

বেঁচে আছেন সেদিনের দুই আনসার সদস্য :

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদানকারী ১২ আনসার সদস্যের মধ্যে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছেন দুজন। তাঁরা হলেন সিরাজ উদ্দিন ও আজিম উদ্দিন শেখ। দুজনই বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছেন। এ বছরও ১৭ এপ্রিল দিবসটি সরকারিভাবে পালন না করাতে আক্ষেপ জানালেন তাঁরা।

আনসার সদস্য সিরাজ উদ্দিন বলেন, ‘আমরা খুব দুঃখ পেলাম। এবার ১৭ এপ্রিল উপলক্ষে ডিসি, ইউএনও, এমনকি কোনো পুলিশ অফিসার আমাদের কিছু বলেননি। সরকার পালন না করলেও আমরা যাব, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ও আমাদের সহযোদ্ধা যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের জন্য দোয়া করব।’

গাংনীতে বজ্রপাতে প্রান গেলো কৃষকের

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা-ভাটপাড়া গ্রামে বজ্রপাতে জারজিস হোসেন (৫৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ভাটপাড়া গ্রামের জোলের মাঠ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জারজিস হোসেন ওই গ্রামের দাউদ হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জারজিস হোসেনসহ আরও দুই কৃষক কলাক্ষেতে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ

জমে বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হয়। একপর্যায়ে বজ্রপাত হলে জারজিস গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নাহিদ হাসান তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল হাসপাতালে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরবর্তীতে পরিবারের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মুজিবনগরে মাদক ব্যাবসায়ির হামলায় যুবক আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরে চোরাই মোবাইল কেনাবেচা নিয়ে দ্বন্দ্বে যুবকের গলায় চাকু দিয়ে আঘাত করে হত্যার চেষ্টায় হুসাইন নামের এক যুবক আহত হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত নয়টার দিকে দারিয়াপুর গ্রামে এঘটনা ঘটে। আহত হুসাইন দারিয়াপুর গ্রামের আকবর আলীর ছেলে।

আহত হুসাইন জানান, গতকাল বুধবার রাতে বিধ্যারপুর গ্রামের মাদক ব্যাবসায়ি আললিনের ছেলে জুয়েল আমার ছোট ভাইয়ের কাছে একটা চোরাই মোবাইল বিক্রি করতে আসে। এসময় আমি আমার ছোট ভাই কে তার কাছ থেকে মোবাইল কিনতে নিষেধ করলে সে উত্তেজিত হয়ে আমার উপর হামলা করে। ঘটনাস্থলে জুয়েল তার কাছে থাকা চাকু বের করে আমার গলায় টান দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা আহত অবস্থায় আমাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতলে নিয়ে এসে চিকিৎসা প্রদান করে।

স্থানীয়রা জানান, জুয়েল একজন মাদক কারবারি সন্ত্রাস। তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর ও মজিবনগর থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।

# [redacted]

[redacted]

ছুটির ঘন্টা সিনেমার পুনরাবৃত্তি… তবে শিশুটি সুস্থ উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের বিএম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটেছে। তৃতীয় শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী সাদিয়া (৮) স্কুল ছুটির পর বাথরুমে আটকা পড়ে দীর্ঘ সময় চিৎকার করেও কোনো সাড়া না পেয়ে প্রাণসংকটে পড়ে। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা স্কুল ভবন ও মূল ফটকে তালা দিয়ে চলে যাওয়ার ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বুধবার (১৫ এপ্রিল) বিকাল প্রায় চারটার দিকে স্কুল ছুটি হলে শিক্ষকরা যথারীতি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। ওই সময় বাথরুমে থাকা সাদিয়া তালাবদ্ধ অবস্থায় ভেতরেই আটকা পড়ে যায়। সময় গড়াতে থাকলে শিশুটি ভয়ে কান্নাকাটি ও চিৎকার শুরু করে। তার চিৎকার স্কুলসংলগ্ন পথচারীদের কানে পৌঁছালে বিষয়টি সামনে আসে।

এদিকে নির্ধারিত সময়েও বাড়িতে না ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন সাদিয়ার বাবা, পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার বাসিন্দা মনিরুল ইসলাম। খোঁজ নিতে এসে তিনিও স্থানীয়দের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের মূল ফটক খুলে ভেতরে প্রবেশ করা হয়।

কিন্তু বিদ্যালয় ভবনের কলাপসিবল দরজা ভেঙে বা খুলে শিশুটিকে বের করা সম্ভব না হওয়ায়, স্থানীয়রা এক পর্যায়ে স্কুলের এক শিক্ষিকাকে ডেকে আনেন। প্রায় এক ঘণ্টা উৎকণ্ঠার পর শিক্ষিকা লিনা ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে অবশেষে সাদিয়াকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় শিশুটি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

ঘটনাটি রাত সাড়ে এগারোটার দিকে জানাজানি হলে গণমাধ্যমকর্মীরা বিদ্যালয়ের অফিসিয়াল নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। তবে বিষয়টি জানতে চাইলে ফোন কেটে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আরো কয়েকজন গণমাধ্যম কর্মী মোবাইল নম্বরটিতে কল দিলেও, আর কোনো কল রিসিভ করা হয়নি। এতে করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে আরও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় রাত প্রায় বারোটার দিকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম। তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার প্রাথমিক তথ্য নেন এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও সাড়া পাননি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, ‘মেয়েটি সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে, এটাই স্বস্তির বিষয়। তবে ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।’

বুহস্পতিবার দুপুরে বি এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোবিনা খানম বলেন,‘আমাদের ভুলের কারণেই এধরণের ঘটনা ঘটেছে। আমাদের সহকারী শিক্ষক স্কুলের পাশে থাকাই স্থানীয়দের মাধ্যমে স্কুল ছুটির কিছুক্ষণ পরেই বাচ্চাটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।’

গাংনীতে ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ইউএনও

গাংনী উপজেলার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন। তিনি উপজেলার মালশাদহ এলাকায় অবস্থিত ব্র্যাক এরিয়া অফিস পরিদর্শন করেন।

এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহ-আল-আজিজ।

পরিদর্শনকালে ইউএনও ব্র্যাকের স্বাস্থ্যসেবিকাদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং মাঠ পর্যায়ে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় ডটস পদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এ সময় প্রায় ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন।

তিনি ব্র্যাকের মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হওয়া

এক রোগীর সঙ্গেও কথা বলেন এবং অন্যদের সচেতন করার পরামর্শ দেন। এ সময় তিনি বলেন, “কোনো ব্যক্তির টানা দুই সপ্তাহের বেশি কাশি থাকলে অবশ্যই কফ পরীক্ষা করাতে হবে।”

এছাড়াও তিনি শিশুদের হাম রোগ সম্পর্কে সচেতনতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদকবিরোধী সচেতনতা, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার এবং সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেন।

পরিদর্শন শেষে তিনি ব্র্যাক কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং গাংনীতে ব্র্যাকের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, এরিয়া ম্যানেজার (প্রগতি) শাহজাহান, উপজেলা অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার সমীর কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (দাবি) আশরাফুল ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার আক্তার হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য, ব্র্যাক বাংলাদেশে যক্ষ্মা (টিবি) নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সংস্থাটি রোগী শনাক্তকরণ, চিকিৎসা প্রদান, বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ এবং ফলোআপসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।